সঞ্জননী ব্যাকরণ ও বাংলা সমাপিকা প্রস্তাবের সম্পূরক 'যে'

১. সঞ্জননী ব্যাকরণ

আমরা সবাই হয়তো খেয়াল করেছি কোন ভাষায় (হোক তা বাংলা, ফরাসি বা ইংরেজি) ধ্বনি, শব্দ বা বাক্যগুলোকে খেয়ালখুশিমতো সাজানো যায় না। যদি আমরা ক-ল-ম এই তিনটি প্রণবকে (Phoneme) বিশেষ একটি কাঠামোতে সাজাই তবে তার একটা অর্থ হয়। কিন্তু যদি এই কাঠামো বদলে দিই তবে অর্থও পালটে যায়: ক-ম-ল। আবার এমন কাঠামোও আছে যার কোন অর্থই নেই: ম-ক-ল, ল-ম-ক। আলাদা আলাদা করে ম, ক কিংবা ল এর কোন অর্থই নেই। শুধু বিশেষ একটি কাঠামোতে প্রণবগুলোকে সাজালেই অর্থের সৃষ্টি হয়।

এর পর 'কলম' শব্দটিকে আমরা যখন বাক্যে ব্যবহার করি তখনও বিশেষ একটি কাঠামো আমাদের অনুসরণ করতে হয় : 'ঋক কলম কেনে'। আমরা সাধারণত বলি না 'কেনে ঋক কলম' কারণ, এটি বাংলা ভাষার প্রচলিত বাক্য কাঠামো নয়। এই যে ক, ল, ম, এ, ন ইত্যাদি প্রণবকে আমরা দু'পর্যায়ে উচ্চারণ করলাম, একবার অর্থহীন প্রণব হিসেবে আরেকবার অর্থবোধক শব্দ হিসেবে, এ ব্যাপারটাকে ফরাসি ভাষাবিদ অঁদ্রে মার্তিনে বলেছেন 'দ্বৈত উচ্চারণ' (Double articulation) যা মানব ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এতে করে অল্প কয়েকটি প্রণব দিয়ে অগণিত কাঠামোতে অসংখ্য শব্দ ও বাক্য তৈরি করা এবং এর ফলশ্রুতিতে ভাষার অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। পশু-পাখীদের চিৎকার-চেঁচামেচি বা গানে প্রাথমিক উচ্চারণ আছে কিন্তু দ্বৈত উচ্চারণ নেই।

কাঠামোবাদী বা সংগঠনবাদী (Structuralist) ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করতেন (এবং এখনও করেন) মানবশিশু শব্দ ও বাক্যগুলো বড়দের কাছ থেকে শুনে শুনে শেখে। শেখার পর শিশু ঐ একই শব্দ ও বাক্য পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম সে ভুল করে প্রায়ই, বড়রা সেসব ভুল শুধরে দেন। এভাবে ভাষা শেখার কাজ এগিয়ে চলে। পরিণত বয়সে যখন কোন নতুন ভাষা আমরা শিখি তখন আমরাও কিছু শব্দ ও বাক্য আত্মস্থ করি। কোন ভাষার যত বেশি শব্দ ও বাক্য শেখা যায় ততই ভাষাটির ওপর শিক্ষার্থীর দখল সুদৃঢ় হয়। এজন্যে কাঠামোবাদীরা মনে করেন ভাষা মানুষের একটি অর্জিত অভ্যাস।

সঞ্জননবাদী (Generativist) ভাষাবিজ্ঞানীরা কাঠামোবাদীদের বক্তব্যের সাথে একমত নন। কোন ভাষা বলার জন্যে সেই ভাষাটির অসংখ্য শব্দ ও বাক্য সম্পূর্ণ আত্মস্থ করা মানব মস্তিষ্কের পক্ষে সম্ভব কি অসম্ভব এ বিতর্কে না গিয়ে সঞ্জননবাদীরা সাফ বলে দেন এর কোনই দরকার নেই। এটা বলার পেছনে যে যুক্তিগুলো তাদের আছে কাঠামোবাদী বৈয়াকরণরা সেগুলো খন্ডন করতে ব্যর্থ হয়েছেন না বলে বলবো সঞ্জননবাদীদের প্রশ্নগুলোকেই তাঁরা এড়িয়ে গেছেন।

প্রথম প্রশ্ন: পরিণত বয়সে অনেক কাজই আমরা শিশুদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শিখে ফেলতে পারি। কিন্তু ভাষা শিখতে গিয়ে আমরা দেখি যে এই একটি ব্যাপারে শিশুরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি চৌকশ। শুধু মাতৃভাষার কথাই ধরুন। যে ভাষাটা শিখতে একটা বুদ্ধিমান বয়স্কের বছরের পর বছর লেগে যাচ্ছে সেখানে দুই-আড়াই বছরের একটা বাচ্চা সেই একই ভাষা গড়গড় করে বলছে। সদ্য কথা ফুটেছে এমন বাচ্চার একটানা বকবকানি শোনার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাদের হয়েছে তারা স্বীকার করবেন যে এর অধিকাংশই শিশুটির উর্বর মস্তিষ্কের সৃষ্টি, কারো কাছ থেকে শোনা কথার গিলিতচর্বণ নয়। আর এই স্বল্প সময়ের মধ্যে অত কথা শুনে মুখস্ত করার সময়ইবা সে পাবে কোথা থেকে!

দ্বিতীয় প্রশ্ন: মায়ের ভাষা যাই হোক না কেন কোন বাঙালি শিশুকে যদি ছোটবেলা থেকে চীনে রাখা হয় তবে সে চীনা শিশুদের মতোই অবলীলায় ম্যান্ডারিন বলবে আর বাংলা বলতে হোঁচট খাবে। কোন চীনা শিশুকে বাংলাদেশে এনে রাখলে ঠিক তার উল্টোটা ঘটবে। কেমন করে শিশুরা অপরিণত মস্তিষ্কের পক্ষে জন্মের দু'এক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর যে কোন ভাষার ব্যাকরণ আয়ত্ব করা সম্ভব হবে?

তৃতীয় প্রশ্ন: মানুষ এমন অনেক বাক্য উচ্চারণ করতে সক্ষম যেগুলো সে শেখা দূরে থাক কানেও শোনেনি বা বাংলাভাষার সৃষ্টি পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত সেসব বাক্য (যেমন, 'গত রাতে ঢাকার শেরাটন হোটেলে দুই এস্কিমো ট্যুরিস্ট গৃহহীন হবার ভয়ে ইগলু খেতে চায়নি') হয়তো উচ্চারিতই হয়নি। কিন্তু কখনও না শোনা একটি বাক্য মানুষ কেমন করে সৃষ্টি করে?

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চমস্কি ও অন্যান্য সঞ্জননবাদী ভাষাবিজ্ঞানীরা একটি Hypothesis বা কল্পানুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। সেটি হচ্ছে প্রত্যেকটি মানবশিশু একটি বিশ্বব্যাকরণের অধিকারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। মাস্টার কি দিয়ে যেমন সব তালা খোলা যায় এ ব্যাকরণটি তেমনি পৃথিবীর তাবৎ ভাষার ব্যাকরণের সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই জন্মগত গুণটির কারণেই মানবশিশুর পক্ষে যে কোন মানব ভাষা খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলা সম্ভব হয়। কিন্তু পৃথিবীর সব ভাষার ব্যাকরণ তো আর এক নয়। পৃথিবীর বেশীর ভাগ শিশু জন্মের পর যে একটি মাত্র ভাষা শেখে (আজকাল অবশ্য শিশু একাধিক ভাষাও শেখে) তাতে এই সার্বজনীন ব্যাকরণটির বেশির ভাগ অংশই কোন কাজে লাগে না। বিশ্বব্যাকরণের যে অংশগুলো শিশু ব্যবহার করে না সে অংশগুলো সে ভুলে যেতে থাকে। এর পরে পরিণত বয়সে আমরা যে নতুন কোন ভাষা শিখতে সমর্থ হই সম্ভবত তারও মূলে আছে মনের অবচেতনে এই বিশ্বব্যাকরণের উপস্থিতি।

জন্মগত বিশ্বব্যাকরণ আর মা-বাবাসহ অন্যান্য পারিপার্শ্বিক লোকজনের ভাষা ব্যবহার শুনে শিশুর মনে জন্মায় 'কমপিটেন্স' যাকে আমরা বলবো 'ভাষাবোধ'। এই ভাষাবোধ থাকার কারণে সে মাতৃভাষার শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বাক্য চিনতে পারে এবং অবলীলায় অসংখ্য শুধু বাক্য

সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। চমস্কি বাক্যকে অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছেন একেবারে প্রথম প্রকাশনাটি থেকে: "এখন থেকে আমরা "ভাষা" বলতে বুঝবো কোন ভাষার বাক্যসমষ্টিকে" (সিন্টাকটিক স্ট্রাকচার)। বাক্যের ওপর অধিকতর গুরুত্বপ্রদান সঞ্জননী ভাষাতত্ত্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টির ব্যাপারটিকে সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানে বলা হয় 'পারফরমেন্স' যাকে আমরা বাংলায় বলবো 'ভাষাপ্রয়োগ'। সঞ্জননবাদীদের মতে ভাষা মানুষের অর্জিত অভ্যাস নয়, ভাষা মানুষের সৃষ্টি। এই সৃষ্টিক্ষমতা মানুষের সহজাত। মানুষের ভাষাবোধ বা জন্মগত ব্যাকরণটি সীমিত কিছু সূত্র বা নিয়মের সমষ্ঠি। এই সীমিত সংখ্যক সূত্র দিয়ে অসংখ্য বাক্য সৃষ্টি বা সঞ্জনন করানো সম্ভব বলে ব্যাকরণটিকে সঞ্জননী বা সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ বলা হয়।[১] এই বিশ্ব ব্যাকরণ বা সীমিত সংখ্যক ব্যাকরণ সূত্রের অসীম সঞ্জননী ক্ষমতা নতুন কোন ধারণা নয়। মধ্যযুগে প্যারিসের পোর্ট রয়ালের বৈয়াকরণেরা এবং তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভিলহেম ফন হুমবোল্ড ভাষার সীমিত উপাদানের অসীম ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। হুমবোল্ড এও ইংগিত দিয়েছেন যে "বিভিন্ন ভাষার একাধিক কাঠামো একটি সাধারণ বিশ্বকাঠামোতে মিলে যেতে পারে" (বার্টিল মাল্মবার্গ: ভাষাতত্ত্বের নতুন ধারা)। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার গবেষকদের মতোই সঞ্জননবাদী বৈয়াকরণদেরও লক্ষ্য বিশেষ একটি ভাষার এমন কিছু সাধারণ নিয়ম আবিস্কার যা দিয়ে ঐ ভাষাটির সমস্ত বাক্যকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বিশ্বব্যাকরণের স্বরূপ কি তা আমরা জানি না কিন্তু প্রচিলত ভাষাগুলোর স্বরূপ আবিস্কার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। সব ভাষার সাধারণ নিয়মগুলো আবিস্কার করা গেলে বিশ্বব্যাকরণের অনেক খানিই যে আমাদের জানা হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

সঞ্জননী ভাষা বিজ্ঞানের জন্ম ১৯৫৭ সালে। এ বছর আমেরিকার পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নোয়াম চমস্কি 'সিনটাকটিক স্ট্রাকচার' (অর্থাৎ বাক্যবিন্যাসের কাঠামো) শিরোনামে নিজের ডক্টরেটের গবেষণা সন্দর্ভটি বই আকারে প্রকাশ করেন। জন্মের পর সঞ্জননবাদী ভাষাবিজ্ঞানের পরিবর্তনের শেষ নেই। চমস্কি নিজে ও অন্যান্যরা নিত্যনতুন তত্ত্ব এনে পুরোনো তত্ত্বগুলোকে বাতিল করে দিচ্ছেন। যে তিনটি প্রধান রচনায় চমস্কির তত্ত্বের এই বিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে সেগুলো হচ্ছে : Syntactic Structure (১৯৫৭), Aspects of the Theory of Syntax (১৯৬৫), Lectures of Government and Binding (১৯৮১) এবং সম্প্রতি Minimalist Program (1995)।

যদিও সঞ্জননবাদীদের কাছে চমস্কির রচনায় একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে তবুও বলতে হবে যে আধুনিক সঞ্জননবাদী তত্ত্বের একটা বড় অংশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষাবিজ্ঞানীদের অবদানে গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে আমেরিকান-ইংরেজ যেমন আছেন তেমনি আছেন জাপানি, ভারতীয়, আরব, ইসরাইলি, ফরাসি... এই প্রথম বারের মতো সারা পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞানীরা একজোট হয়ে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে খুঁজে চলেছেন 'ঈশ্বরের কারসাজিতে হারিয়ে যাওয়া বাবেল মিনারের মূলভাষাটিকে'।[২]

২. বাক্য, প্রস্তাব ও বর্গ

কোন বাক্যে একাধিক প্রস্তাব বা খন্ড বাক্য (Clause) থাকতে পারে আবার শুধু একটি মাত্র প্রস্তাব নিয়েও একটি বাক্য গঠিত হতে পারে।[৩]

১. [ঋক বই পড়ছে]

২. [গার্গী জানে] [যে ঋক বই পড়ছে]

১নং বাক্যে একটিই প্রস্তাব। এ ধরনের উদাহরণে 'প্রস্তাব' আর 'বাক্যকে' সমার্থক মনে হতে পারে। কিন্তু ২নং বাক্যে দু'টি প্রস্তাবের উপস্থিতি 'প্রস্তাব' আর 'বাক্যের' পার্থক্যকে স্পষ্ট করে। এ উদাহরণে 'গার্গী জানে' এবং 'যে ঋক বই পড়ছে' দু'টি আলাদা প্রস্তাব। প্রতিটি প্রস্তাব আবার একাধিক আসন্ন বা অব্যবহিত উপাদান (Immediate Constituent) এর সমষ্টি। ১নং বাক্যে আমরা প্রথমে দুটি আসন্ন উপাদান পাচ্ছি: (ক) ঋক (খ) বই পড়ছে। দ্বিতীয় আসন্ন উপাদান (খ) কে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে (গ) বই এবং (ঘ) পড়ছে এই দু'টি আসন্ন উপাদান।

১নং বাক্যে 'ঋক' ও 'বই' দুটি আলাদা বৈয়াকরণিক বৃত্তি (Grammatical function) পালন করছে, ঋক হচ্ছে কর্তা (Subject), বই হচ্ছে কর্ম (Object)। ১নং বাক্যটি হচ্ছে বাংলা ভাষার সরলতম বা 'আদি' (Kernel) বাক্যের একটি উদাহরণ। এ ধরণের বাংলা আদি বাক্যে বৈয়াকরণিক বৃত্তিগুলো কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এই ক্রমে সাজানো থাকে। এ জন্যে বাংলার মতো বৃত্তিক্রম আছে এমন সব ভাষাকে (যেমন, হিন্দি) SOV ভাষা বলা হয়। এছাড়া SOV (ইংরেজি, ফরাসি), VSO, OSV ইত্যাদি বৃত্তিক্রমের ভাষাও আছে।

কর্তা 'ঋক' এর জায়গায় 'প্যারিস ঘুরে আসা ঋক', কর্ম 'বই' জায়গায় 'বিজ্ঞানের কলা', 'শাহবাগ থেকে কেনা বই' ইত্যাদি, 'পড়ছে''র জায়গায় 'মনোযোগ দিয়ে পড়ছে, 'বানান করে করে পড়ছে' ইত্যাদি বসানো যেতে পারে। আবার 'প্যারিস ঘুরে আসা', 'শাহবাগ থেকে', 'বানান করে' ইত্যাদি বাদ দিলেও প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য থাকে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে 'ঋক' 'বই' এবং 'পড়ছে' এই তিনটি উপাদান তিনটি পৃথক পদসমষ্টি বা পদবর্গের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ ধরনের পদবর্গকে ইংরেজিতে Phrase বলে। আমরা বাংলায় এদেরকে 'বর্গ' বলবো।[৪] বর্গগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এদের কেন্দ্রে একটি পদ আছে। কেন্দ্রের এই পদটি হচ্ছে বর্গের শির (অর্থাৎ Head; আমরা মাথা বা মূলও বলতে পারি)। সে পদটি যদি বিশেষ্য হয় তবে সম্পূর্ণ বর্গটিকে আমরা বলবো বিশেষ্য বর্গ বা নাম বর্গ (Noun phrase বা NP)। যদি বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণ হয় কেন্দ্রের পদটি তবে বর্গটির নাম হবে বিশেষণ বর্গ বা বিণবর্গ (Adjectival phrase বা AP)। আর কেন্দ্রে ক্রিয়াপদযুক্ত কোন বর্গের নাম হবে ক্রিয়াবর্গ বা ক্রিবর্গ (Verb phrase বা VP)। যেমন:

নামবর্গ:
'ভাষাবিজ্ঞানের **বইটি**', 'হাতলভাঙ্গা **চেয়ার**', ফেল করা **ছেলেটি**' ইত্যাদি।

বিণবর্গ :
'খুব **ভালো**', 'টকটকে **লাল**', 'গোলাপের মতো **সুন্দর**', 'অত্যন্ত দ্রুত' ইত্যাদি।

ক্রিয়াবর্গ :
'বই **পড়ছে**', 'তাড়াতাড়ি গাড়ি **চালাচ্ছে**', ইত্যাদি।

২. বর্গ ও 'X' কাঠামো :

সঞ্জননী ব্যাকরণে 'বর্গ' আর 'প্রস্তাব' এই উভয়ের বিশ্লেষণে X-বার কাঠামো ব্যবহার করা হয়। এ কাঠামোতে প্রথমে থাকে একটি মূল শাখাসন্ধি বা গিট (Noeud)। এই শাখাসন্ধি থেকে দু'টি মাত্র শাখা (Branch) বের হয়। প্রতিটি শাখার অগ্রভাগে নতুন একটি শাখাসন্ধি থাকতে পারে এবং সেখান থেকে নতুন শাখা বের হতে পারে (অবশ্য সন্ধিটি শাখাহীন বা বন্ধ্যাও হতে পারে)। 'X'-বার কাঠামোতে বিশ্লেষিত বাক্য বা বর্গকে বৃক্ষের মতো দেখায় বলে এদের বৃক্ষচিত্র (Tree) বলা হয়। তবে সাধারণ বৃক্ষের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে এর শাখাগুলো নীচের দিকে আর মূল থাকে উপরের দিকে।

এ ধরনের বৃক্ষচিত্রে X^0 (X জিরো), X′ (X-বার) আর X″ (X-ডাবল বার) এই তিনটি স্তরে আছে। সর্বোচ্চ স্তরে X″-কে বিশ্লেষণ করলে আমরা মধ্যম স্তরে পাবো বামদিকে নির্দেশক বা বিশেষক (Specifier) আর ডানদিকে X′ । এর পরে X′ কে ভাঙলে সর্বনিম্ন স্তরে পাবো পূরক (Complement) আর শির (X^0)। ভাষাবিশেষে এই পূরক বা শির বামদিকে বা ডানদিকে থাকতে পারে। পূরকের অবস্থান অনুসারে কোন ভাষাকে বাম শাখা প্রসারী (বা বামপ্রসারী) আর ডান শাখাপ্রসারী এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। বাংলায় বা হিন্দিতে পূরক বাদদিকে থাকে বিধায় এরা বামপ্রসারী ভাষা (Left branching language) আর ইংরেজী-ফরাসী ডানপ্রসারী (Right branching) কারণ এদের পূরক থাকে ডানদিকে।

বর্গের শির X^0 এর প্রকৃতি অনুসারে বর্গের নাম। সুতরাং নাম বর্গের শির হবে N^0, বিণবর্গের শির হবে A^0, আর ক্রিবর্গের শির হবে V^0। যেমন ধরা যাক, 'একটি বিজ্ঞানের বই' এই নামবর্গটিতে 'বই' N^0 বা নামশির। N^0'র পূরক হচ্ছে 'বিজ্ঞানের' এই কারক বর্গটি (KP)। পূরক আর শির মিলে N′ (বিজ্ঞানের বই)। 'একটি' হচ্ছে সম্পূর্ণ বর্গটির নির্দেশক। 'বিজ্ঞানের' কারক বর্গটির (KP) K^0 বা কারক শির হচ্ছে বিভক্ত 'এর' এবং তার পূরক হচ্ছে নামবর্গ 'বিজ্ঞান'। এই সর্বশেষ নামবর্গটির বিশেষক নেই, পূরক নেই। একা 'বিজ্ঞান' সম্পূর্ণ নামবর্গের প্রতিনিধিত্ব করছে।

অন্যভাবে বলা যায় NP বা N″ 'একটি বিজ্ঞানের বই' কে বিশ্লেষণ করলে মধ্যম স্তরে পাওয়া যাবে নির্দেশক 'একটি' আর N′। এরপরে N′ কে ভাঙলে সর্বশেষ স্তরে পাওয়া যাবে

নামশির (N^0), বই আর পূরক KP (বিজ্ঞানের)। KP এর সর্বশেষ স্তরে রয়েছে কারক শির K^0 (বিভক্তি) 'এর' এবং তার পূরক নামবর্গ তথা নামশির 'বিজ্ঞান'।

৩. অনুবর্গ ও কারক বর্গ

ইউরোপীয় ভাষা যেমন ইংরেজি-ফরাসি-জার্মানে Preposition বা পুরসর্গ বলে একটি পদ আছে। in, to, of, by, for, near ইত্যাদি Preposition-কে কেন্দ্রে নিয়ে পুরবর্গ (Prepositional Phrase বা PP) গঠিত হয়। বাংলাতে এ ধরনের Preposition এর অস্তিত্ব নেই। এর বদলে আছে 'দ্বারা', 'জন্যে', কাছে ইত্যাদি অনুসর্গ, পরসর্গ বা কারক অব্যয় বা Preposition । এরা অনুসর্গ বর্গ বা অনুবর্গ (যেমন: 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে', 'ঋকের দ্বারা', 'সমাজের জন্যে' ইত্যাদি) বা অনুবর্গ গঠন করতে পারে।

কিন্তু শুধু অনুবর্গ দিয়ে বাংলায় কাজ চলবে না, in, to ইত্যাদি Preposition এর অনুবাদে বাংলায় সব সময় অনুসর্গের ব্যবহার হয় না, শব্দ বিভক্তিও (সুপ) ব্যবহার করা হয়। যেমন, 'গার্গীকে', 'চট্টগ্রামের', 'বাংলাদেশে'। এই সব শব্দ বিভক্তি (কে, এর, এ) অনুসর্গের মতোই কারক নির্দেশ করে যেমন, 'দ্বারা' (করণ কারক) 'থেকে' (অপাদান কারক), 'কে' (কর্মকারক), 'এ', 'তে' (অধিকরণ কারক) ইত্যাদি। এ সমস্ত বিভক্তিকে আর অনুসর্গকে একসাথে কারক বর্গ (KP) হিসেবে দেখাতে পারলে আমাদের সুবিধে হতো কারণ বিভক্তিগুলো অনুসর্গের মতোই বর্গের সর্বডানে অবস্থান করে।

কিন্তু আমরা তা পারি না। কেন পারি না সেটা বুঝতে হলে আমাদের **'শাসন'** (Government) ব্যাপারটি বুঝতে হবে। ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসি, ইংরেজি ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষায় ক্রিয়াপদ এবং Preposition তাদের Complement-কে একটি বিশেষ রূপ নিতে বাধ্য করে কিংবা পূরক নামপদই হয়তো শাসককে সম্মান দেখিয়ে 'পতিত' হয় (Case শব্দটি যে ল্যাটিন শব্দ 'Casus' থেকে এসেছে তার অর্থ 'পতন') বা অধীনতার চিহ্নস্বরূপ একটি কারকচিহ্ন বা বিভক্তি গ্রহণে বাধ্য হয় (যেমন called me; with him ইত্যাদিতে I হয়ে যাচ্ছে me আর he হচ্ছে him। এ দুটোই Objective case বা কর্মকারক। সংস্কৃত, হিন্দি বা বাংলাতেও আমরা একই ব্যাপার লক্ষ্য করি। ক্রিয়াপদ আর পুরসর্গ/অনুসর্গের এই আচরণটির নামই 'শাসন'।

৩) [গার্গী ঋককে দেখেছে]

৪) [ঋক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে থাকে]

ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে (ইংরেজি/ফরাসি) কর্মকারকে (Direct object) প্রায়ই শূন্য বিভক্তি হয় এবং অপাদান, অধিকরণ, সম্প্রদান ও করণকারক Preposition দিয়ে দেখানো হয়। কিন্তু বাংলায় এক কর্মকারকেই শূন্য বিভক্তি, কে-বিভক্তি এবং অনুসর্গের ব্যবহার

তিনটাই হতে পারে (ঋক বই পড়ে; গার্গী ঋককে ডেকেছে; গার্গী ঋকের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে)। অন্য কারকেও বিভক্তি আর অনুসর্গ দুয়েরই ব্যবহার হয়।

ইংরেজিতে Near the University-তে এই near হবে পুরবর্গের কেন্দ্র এবং the University হবে পূরক। কিন্তু বাংলা 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে' এই অনুবর্গে যদি 'কাছে'-কে অনুবর্গটির কেন্দ্র ধরি তবে তার পূরক হয় আরেকটি কারক বর্গ (বিশ্ববিদ্যালয়ের)। চমস্কি (১৯৮১) কারককে নামপদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসেবে দেখার পক্ষপাতী। অর্থাৎ with me র me কে তিনি KP হিসেবে দেখাতে নারাজ। তার মতে NP = KP। সেদিক থেকে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের' পদটিকে আমরা NP হিসেবে দেখাতে পারি যেমন ইংরেজিতে দেখাবো me কে me যদিও objective case।

কিন্তু 'ঋক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে' বাক্যে 'বিশ্ববিদ্যালয়ে' বর্গটিকে কিভাবে দেখাবো? নামবর্গ না অনুবর্গ না কারকবর্গ? এক্ষেত্রে 'এ' বিভক্তিকে বর্গের অন্তর্নিহিত ব্যাপার বলে মানা যায় না। তাহলে Preposition কেও NP'র অন্তনির্হিত ব্যাপার বলে মেনে নিতে হয় (কিন্তু তা মানা হয় না, হতে পারে না)। বিভক্তিটিকে আলাদা করে দেখাতে হবে, অনুবর্গ হিসেবে দেখানো যায় না, কারণ তাহলে সব বিভক্তিযুক্ত নাম পদকেই (ঋককে, ঋকের) সেভাবে দেখাতে হবে। আবার 'বিশ্ববিদ্যালয়ে'কে যদি কারকবর্গ বলি তবে সেক্ষেত্রে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে' অনুবর্গ হবে কিভাবে? এটাওতো কারক বর্গ ('বিশ্ববিদ্যালয়ে' এবং 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে' দু'টোই অধিকরণ কারক)।

আমার মনে হয় বাংলার মতো ভাষাগুলোতে কারকবর্গ (KP) এবং অনুবর্গ (PP) এই দুইই রাখতে হবে। কারকবর্গের কেন্দ্রে থাকবে বিভক্তি আর পূরক হবে নামপদ। অনুবর্গের কেন্দ্র হবে অনুসর্গ আর পূরক হবে আরেকটি কারকবর্গ যার কেন্দ্রে থাকবে বিভক্তি আর পূরক হবে নামপদ।

অনেক সঞ্জননবাদী বৈয়াকরণ অনুসর্গকে আভিধানিক রূপমূল (Lexical morpheme) মনে করেন না।[৫] এর মানে কি এই, যে এগুলো নাম, ক্রিয়া বা বিণপদের মতো মুক্তরূপমূল নয়? কিন্তু মুক্ত রূপমূল না হলেও বাংলার সব অনুসর্গ বিভক্তির মত অতটা বদ্ধ নয়। অনেক অনুসর্গ নামপদজাত এবং তাদের নিজস্ব একটি অর্থও আছে (যেমন 'পিছনে' বা 'উপরে')। সুতরাং অনুবর্গ ও কারক বর্গ দুইই থাকলে অনুসর্গ আর বিভক্তির মধ্যে এই অর্থগত পার্থক্যটি বাক্য বিন্যাসে প্রতিফলিত হবে (কারক বর্গ ≠ অনুবর্গ) এটা আমাদের ব্যাকরণের একটা ইতিবাচক দিক।

৪. প্রস্তাব ও 'X' কাঠামো:

বর্গকে যেভাবে X-বার কাঠামোতে বিশ্লেষণ করা হলো তেমনি করা যেতে পারে প্রস্তাবকে। প্রস্তাবকে বলা হয় CP (X″) বা সম্পূরক বর্গ (Complement phrase)। এখানে ইংরেজির Phrase এর মতোই 'বর্গ' শব্দটির অর্থের প্রসারণ ঘটবে। যদিও CP মানে

পুরো একটি প্রস্তাব তবু আমাদের কাঠামোর স্বার্থে আমরা একে 'সম্পূরক বর্গ' বলবো। CP-কে বিশ্লেষণ করলে পাবো নির্দেশক আর C″। এরপর C′-কে ভাঙলে পাবো শির (C^0) আর C^0 এর পূরক IP বা Inflexion phrase (বা ক্রিয়াবিভক্তি বর্গ বা তিঙবর্গ)।

IP-কে ভাঙলে পাওয়া যাবে নির্দেশক NP এবং I′। এই I′ এর শির হচ্ছে I^0 বা তিঙ আর পূরক হচ্ছে VP বা ক্রিয়া বর্গ। ক্রিয়াবর্গের শির হচ্ছে V^0 বা ক্রিয়ামূল (ধাতু) আর পূরক হতে পারে যে কোন বর্গ- নাম, অনু, কারক ইত্যাদি। এই পূরকটিই প্রস্তাবের কর্ম। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে প্রস্তাবের কর্তাকে ক্রিয়াবর্গের নির্দেশক বলা হচ্ছে। 'একটি বিজ্ঞানের বই'– এই নামবর্গটিতে 'একটি' যেমন নির্দেশকের ভূমিকা পালন করছে, 'ঋক পড়ছে' এই ক্রিয়াবর্গে NP 'ঋক' ও তাই করছে।

উপরের বৃক্ষ চিত্রে প্রস্তাবটি তার অগভীর স্তরে (Shallow structure) আছে। এরপর কোন একটি শির বা সম্পূর্ণ একটি বর্গ ডানদিকে কোন একটি অবস্থানের উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করতে পারে। এই স্থান ত্যাগ করে নতুন জায়গায় যাওয়াকে আমরা বলবো 'অভিবাসন' (Mouvement)। অভিবাসনের ফলে প্রস্তাবটিতে যে পরিবর্তন আসে তার নাম 'রূপান্তর' (Transformation)। এই রূপান্তরের ফলে প্রস্তাবটি চলে আসে ভূমি স্তরে (Surface structure)।[৬]

৫) [বই] [যে ঋক t পড়ছে]

৬) [ঋক] [যে বই t পড়ছে]

৫নং প্রস্তাবে কর্ম NP 'বই' এবং ৬নং প্রস্তাবে কর্তা NP 'ঋক' গিয়ে দখল করেছে C′ এর নির্দেশকের স্থান। অভিবাসনের ক্ষেত্রে এ স্থানটির ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি। কোন উপাদান অভিবাসন করলেও তার বাস্তুভিটা (Position) অন্য কেউ দখল করতে পারে না, কারণ উপাদানটি যাবার আগে একটি Trace (t) বা বাস্তুচিহ্ন রেখে যায়। তবে অনেক সময় কোন একটি স্থান পুরোপুরি খালিও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে স্থানটিকে e চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয় (উদাহরণ : spec CP)।

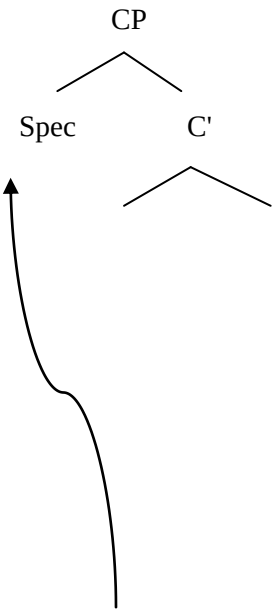

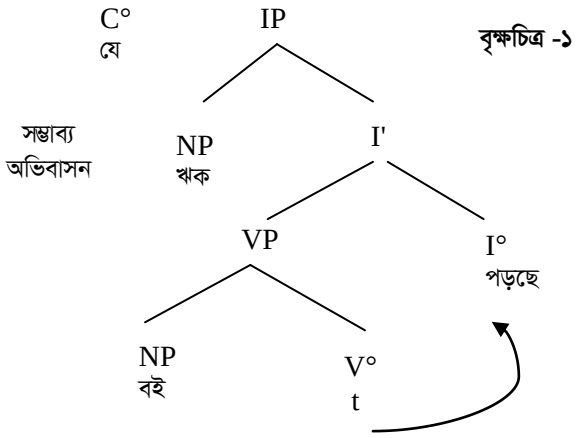

একটি সম্পূর্ণ C বা সম্পূরক প্রস্তাব অন্য একটি প্রস্তাবের মূল ক্রিয়ার পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ প্রবন্ধের শুরুতে ২নং উদাহরণে আমরা তা দেখেছি। 'গার্গী জানে' এখানে মূখ্য প্রস্তাব। 'যে ঋক কলা খাছে'-প্রস্তাবটি মূখ্য প্রস্তাবের পূরক। পূরক প্রস্তাব মূখ্য প্রস্তাব ছাড়া একা ব্যবহৃত হতে পারে না বলে একে গৌণ বা আশ্রিত প্রস্তাবও বলা হয়।

কিছু কিছু বৈয়াকরণিক রূপমূল (ভারতীয় ব্যাকরণ ধারায় এদের নাম 'অব্যয়') এ ধরনের আশ্রিত প্রস্তাবকে মূখ্য প্রস্তাবের সাথে যুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। সঞ্জননী ব্যাকরণে এদের নাম কমপ্লিমেন্টাইজার (Complementizer)। এরা C^0 স্থানে বসে। আমরা বাংলায় এদের 'সম্পূরক' বলবো। আশ্রিত প্রস্তাব চেনার একটা উপায় হচ্ছে এই প্রস্তাবে সম্পূরক উক্ত বা Overt আর মূখ্য প্রস্তাবে তা অনুক্ত বা Covert বা উহ্য থাকে।

ক্রিয়ার ধরণ অনুসারেও প্রস্তাবকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। আমরা এতক্ষণ যে প্রস্তাবগুলো দেখলাম সেগুলো সবই সমাপিকা প্রস্তাব, কারণ এদের V^0 বা ক্রিয়াটি I^0 স্থানে উঠে গিয়ে তিঙন্ত বা সমাপিকা বা ক্রিয়ার পরিণত হয়। কিন্তু এমন কিছু প্রস্তাবও আছে যেগুলোর V^0 তিঙন্ত বা সমাপিকায় পরিণত হয় না।

৭। [ঋক [বই পড়ে] ঘুমাতে যাবে]।

৮। [গার্গী [ঋককে বই পড়তে] দেখেছে]।

উপরের বাক্যদু'টিতে 'ঋক বই পড়ে' এবং 'ঋক বই পড়তে' এই দুটি প্রস্তাব তিঙন্ত নয়, অর্থাৎ অসামপিকা। সুতরাং আমরা এগুলোকে অসমাপিকা প্রস্তাব বলবো। অসমাপিকা প্রস্তাব বা তার সম্পূরক বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা আমাদের আলোচনা সমাপিকা প্রস্তাব এবং এর সম্পূরকের স্বরূপ বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো।

৫. সম্পূরক 'যে'

বাংলা ভাষায় সমাপিকা প্রস্তাবে একটি সম্পূরক বা কমপ্লিমেন্টাইজার আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি। সেটি হচ্ছে 'যে'। আমাদের পরিচিত অন্য কয়েকটি ভাষার সম্পূরকের (যেমন ইংরেজির that বা ফরাসি que) সাধারণ সব বৈশিষ্ট্যগুলোই এর আছে। আদি মূল প্রস্তাবে (Kernel principal clause) এই 'যে' অনুক্ত থাকে (উদাহরণ ১ক)। তবে আদি পূরক প্রস্তাবে (Kernel subordinate clause) 'যে' উক্ত (Overt) (উদাহরণ ২খ) বা অনুক্ত (Covert) থাকতে পারে (উদাহরণ ২গ)। যেমন :

১ক) *[যে গার্গী জানে][৭] ২খ) [গার্গী জানে] [যে ঋক বই পড়ছে]

২গ) [গার্গী জানে] [e ঋক বই পড়ছে]

বাংলা আদি বাক্যে সম্পূরক 'যে'র স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। 'যে' সবসময় মূখ্য প্রস্তাবের ক্রিয়া (V°) এবং পূরক প্রস্তাবের তিঙবর্গের (IP) নির্দেশক (অর্থাৎ প্রস্তাবটি কর্তা) এ দু'য়ের মাঝখানে বসে (উদাহরণ ২খ)। আদিবাক্যে সাধারণ উপাদান বিন্যাস: সম্পূরক-কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (উদাহরণ ২খ) অটুট থাকা অত্যাবশক। যদি তা না হয় অর্থাৎ কোন একটি উপাদান যদি তার স্থান পরিবর্তন করে তবে বাক্যটি তার গ্রহণযোগ্যতা হারায় (উদাহরণ : ২ঙ ও ২চ)

২ঘ) ? [গার্গী জানে] [ঋক যে বই পড়ছে] ২ঙ) *[গার্গী জানে] [ঋক বই পড়ছে যে]

২চ) *[গার্গী জানে] [ঋক বই যে পড়ছে]

বাক্যগুলো গ্রহণযোগ্যতা ফিরে পায় যদি সম্পূর্ণ পূরক প্রস্তাবটি অভিবাসন করে মূল প্রস্তাবের সম্পূরকের বামে গিয়ে এর নির্দেশকের স্থানটি দখল করে। বাংলাবাক্যের উপাদান বিন্যাসে এমন একটি স্ক্র্যাম্বলিং (Scrambling) বা 'বিপর্যাস' (রূপান্তর একাধিক হলে আমরা 'স্ক্র্যাম্বলিং' বা 'বিপর্যাস' বলবো) প্রায়ই ঘটে থাকে।

২ছ) [ঋক [যে t বই পড়ছে]] [গার্গী জানে t] ২জ) [ঋক বই [যে t t পড়ছে]] [গার্গী জানে t]

২ঝ) [বই যে ঋক পড়ছে] [গার্গী জানে t] ২ঞ) * [যে ঋক বই পড়ছে] [গার্গী জানে t]

বিপর্যাসের পরে একটি নতুন ব্যাপার ঘটে। মূল প্রস্তাবের ডান দিকে থাকাকালীন সময়ে পূরক প্রস্তাবের অভ্যন্তরে বিপর্যাস নিষিদ্ধ– এটা আমরা দেখেছি। বাম দিকে আসার পর বিপর্যাস

করাটাই বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে (উদাহরণ: ২ছ ঝ)। পূরক প্রস্তাবে বিপর্যাসের অভাবে ২ঞ বাক্যটি তার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। অবশ্য বাক্যের আদিতে 'যে' উক্ত থাকার কারণে বা সম্পূরক স্থানে 'যে' উক্ত থাকার কারণেও এটা হতে পারে। যাহোক, এই আন্তঃপ্রস্তাব বিপর্যাস যদি আমরা না করতে চাই তবে পূরক প্রস্তাবের সম্পূরক স্থানে উদাহারণ ২ট এর মতো 'যে'-কে অনুক্ত রাখতে হবে।[৮] পূরক প্রস্তাবের অভিবাসনের আগে এ রকম কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, সম্পূরক স্থানে 'যে' উক্ত বা অনুক্ত থাকতে পারতো (উদাহরণ ২খ, ২গ) :

২ট) [ঋক বই পড়ছে] [গার্গী জানে t] ২ঠ) ? [ঋক বই পড়ছে] [যে গার্গী জানে t]

আমরা দেখলাম, পূরক প্রস্তাব স্থান পরিবর্তন করে বাক্যের আভ্যন্তরীণ বিপর্যাসকে বৈধতা দেবার জন্যে। কিন্তু পূরক প্রস্তাবের স্থান পরিবর্তনের ফলে কি পুরো বাক্যটির অর্থগত কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। কেমন এই পরিবর্তন? পরিবর্তনটির নাম Focalization যাকে বাংলায় বলা যেতে পারে 'উজ্জ্বলন'।

২ছ) [ঋক [যে t বই পড়ছে]] [গার্গী জানে t] ২জ) [ঋক বই [যে t t পড়ছে]] [গার্গী জানে t]

২ঝ) [বই যে ঋক পড়ছে] [গার্গী জানে t]

যে উপাদানটি 'যে'র অব্যবহিত পূর্বে বসে সেটিকে Focalized বা উজ্জ্বলিত হয়। প্রশ্ন হতে পারে: 'যে' কি উজ্জ্বলক ভূমিকাও পালন করে? বাংলা ভাষায় দু'টি পরিচিত Focalizer বা 'উজ্জ্বলক' আছে: ই এবং ও। এই দুটি উজ্জ্বলক কোন একটি শব্দে পর পর যুক্ত হতে পারে না।

৯ক) *[ঋকইও বই পড়ছে] ৯খ) *[ঋকওই বইই পড়ছে]

কিন্তু 'যে' একই শব্দে অন্য উজ্জ্বলকের সাথে ব্যবহৃত হতে পারে।

৯ক) [ঋকইযে বই পড়ছে] [গার্গী তা জানে] ৯খ) [ঋকওযে বইই পড়ছে] [গার্গী তা জানে]

যে যদি উজ্জ্বলক হতো তবে তবে ই বা ও'র সঙ্গে একত্রে অবস্থান করতে পারতো না। যদি প্রশ্ন করা হয়: উজ্জ্বলক যদি নাই হবে তবে 'যে' তার অগ্রবর্তী উপাদানকে কিভাবে উজ্জ্বল করছে? আমরা বলবো এখানে 'যে'-র কোন ভূমিকা নেই। উজ্জ্বলন হচ্ছে নামশব্দের অভিবাসনের কারণে।

বাংলায় 'যে'-র মতো আরও অন্তত দুটি উপাদান আছে:'তো' এবং 'না'। এই উপাদানগুলোও ই এবং ও এর সাথে সহাবস্থান করতে পারে। কিন্তু এগুলো 'যে'-র সাথে সহাবস্থান করতে পারে না ।

৯গ) [ঋকতো বই পড়ছে]　　৯ঘ) [ঋক না বইই পড়ছে]?

৯গ) [ঋকইনা বই পড়ছে]　　৯ঘ) [ঋকওতো বইই পড়ছে]

৯ঙ)* [ঋকযেতো বই পড়ছে]　　৯চ) *[ঋকযে না বইই পড়ছে]?

'যে'-এর মতোই একই বাক্যে একাধিক তো বা না ব্যবহৃত হতে পারে না।

৯ছ)* [ঋকযে বইযে পড়ছে]　　৯জ)* [ঋকতো বইতো পড়ছে]

৯ঝ) *[ঋক না বই না পড়ছে]?

উপরের উদাহরণগুলোর আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে তো, না এবং যে সম্পূরক, কোনমতেই উজ্জ্বলক নয়।

১নং বৃক্ষচিত্রে আমরা সহজেই বাক্য ২ছ আর ২ঝ এর পূরক প্রস্তাব দু'টি দেখাতে পারি। কিন্তু বাক্য ২জ এর 'ঋক বই যে পড়ছে' দেখানো আমাদের পক্ষে কঠিন। কারণ এখানে কর্তা (NPS) এবং কর্ম নামপদ (NPO) দুটোই একই সময়ে C^0 এর বামদিকে স্থান পরিবর্তন করে কিন্তু সেখানে C″ এর নির্দেশকের জায়গাটিই শুধু খালি আছে। 'ঋক কলা যে খাচ্ছে' প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য না হলে আমাদের সুবিধা হতো। আমরা দু'টি স্থানান্তরিত উপাদানের জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক জায়গা না থাকাকে বাক্যটির গ্রহণযোগ্যতা হারানোর কারণ হিসেবে দেখাতে পারতাম। কিন্তু জায়গা থাকলেও 'ঋক' কেন অভিবাসন করবে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ 'ঋক বই যে পড়ছে' বাক্যে 'ঋক' উজ্জ্বলিত হচ্ছে না।

এ ধরণের উদাহরণ বাক্যবিশ্লেষণে সঞ্জননী তত্ত্বের কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

টীকা

১) Generative কথাটির তিনটি প্রতিশব্দ চালু আছে : সৃষ্টিশীল, সঞ্জননী ও উৎপাদনী। আমরা বাংলা ভাষাবোধ 'সৃষ্টিশীল' বিশেষণটি জড় পদার্থের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত করে। (ক্ষমাশীল, মরণশীল... এইসব মানবীয় বিশেষণগুলোর কারণে কি?) 'উৎপাদনী' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। 'সঞ্জননী' শব্দটি সংস্কৃত ঘেঁষা হলেও অর্থ ও প্রয়োগের দিক থেকে উপযুক্ত এবং বুৎপত্তিগত (ইন্দোইউরোপীয়) দিক থেকেও Generative এর কাছাকাছি।

আধুনিক যুগে ব্যাকরণসূত্রের এই সঞ্জননী ক্ষমতার কথা প্রথম উল্লেখ করেছেন চমস্কি আর তার সহযোগী বৈয়াকরণরা। সুতরাং 'সঞ্জননবাদী' বলতে আমরা তাদেরই বুঝি এবং তাদের ব্যাকরণই সঞ্জননী ব্যাকরণ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। কিন্তু যে কোন ব্যকরণকেই সঞ্জননী বলা যেতে পারে এ

যুক্তিতে যে কোন ব্যাকরণেই সূত্র সংখ্যা অসীম নয়। সব ব্যাকরণই (প্রথাগত, কাঠামোবাদী, বিতরণবাদী (Distributionalist)... সীমিত সূত্রের সাহায্যে অসংখ্য বাক্য সৃষ্টি করে।

সঞ্জননবাদীরা যে সব সূত্রের কথা বলেন সেগুলো এক ধরণের কাঠামো বই আর কিছু নয়। এদিক থেকে দেখলে সঞ্জননবাদী ব্যাকরণকে কাঠামোবাদী ব্যাকরণের বিবর্তিত বা অগ্রসর রূপ বলা যেতে পারে। তবে এই দুই ঘরনার ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে এতো মতবিরোধের কারণ কি? দৃষ্টিভঙ্গি আর যুক্তি-বিশ্বাসের পার্থক্য এদের মতবিভেদের কারণ কিন্তু এই মতবিভেধকে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধে পরিনত করেছে তাদের মধ্যে বিদ্যমান প্রজন্মের ব্যবধান, সঞ্জননবাদীদের অবজ্ঞা আর কাঠামোবদীদের ইর্ষা অথবা এর উল্টোটা। দুই দলের অনেক আপোষকামী সদস্যই আমার জানামতে উপরোক্ত মত পোষণ করেন।

২) সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ কথা ছিল। পরে লোকেরা পূর্বদিকে ভ্রমণ করিতে শিনিয়র দেশে এক সমস্থলী পাইয়া পরস্পর কহিল, আইস, আমরা আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও গগণস্পর্শী এক উচ্চগৃহ নির্মাণ করিয়া আপনাদের নাম বিখ্যাত করি, পাছে সমস্ত ভূমন্ডলে ছিন্ন ভিন্ন হই। সদাপ্রভু কহিলেন, দেখ, তাহারা এক জাতি ও এক ভাষাবাদী; এখন এই কর্মে প্রবৃত্ত হইল; ইহার পরে যে কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহা নিবারিত হইবেনা। আইস, আমরা নীচে গিয়া, সেই স্থানে ভাষার ভেদ জন্মাই, যেন তাহারা এক জন অন্যের ভাষা বুঝিতে না পারে। আর সদাপ্রভু তথা হইতে সমস্ত ভূমন্ডলে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন, এবং তাহারা নগর পত্তন হইতে নিবৃত্ত হইল। এই জন্য সেই নগরের নাম বাবিল [ভেদ] থাকিল; (আদি পুস্তক ১১.২-৯ এর অংশবিশেষ; বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কৃত অনুবাদ)

৩) ইংরেজি এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'খন্ডবাক্য' কথাটি অনেকদিন ধরে চালু আছে, এটা ঠিক। কিন্তু 'খন্ড বাক্য' শব্দটির অর্থ স্পষ্ট নয়। 'খন্ড যে বাক্য=খন্ড বাক্য', কর্মধারয় সমাস। কিন্তু খন্ডবাক্য বলতে আমরা যা বুঝি তা সবসময় খন্ড নয়, পূর্ণও হতে পারে। সাবর্ডিনেট ক্লজকে খন্ড বলে চালানো যেতে পারে কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লজকে 'খন্ড' কলা যাবে না কোন মতেই। প্রিন্সিপাল ক্লজ বাক্যের সমতুল্য। অন্যদিকে বাক্যের খন্ডকে 'খন্ডবাক্য' (বা বাক্য খন্ড) বলা আর হাতকে হাত না বলে 'অংশ শরীর' বলা একই কথা। মোটকথা প্রতিটি নির্দেশিত (Referent বা বস্তু) এর জন্যে আলাদা আলাদা দ্যোতকের (Signifier) ব্যবহার বাঞ্চনীয়।

আমি প্রস্তাবকে 'ক্লজে'র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছি। এটা ফরাসি Proposition এর অনুবাদ। Proposition শব্দটি ফরাসি ভাষায় 'ক্লজ' অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে ১৬৯০ সাল থেকে। এর অর্থ : ন্যুনতম উদ্দেশ্য ও বিধেয় সমন্বিত বাক্যাংশ। Proposition কথাটি ফরাসিতে যুক্তিবিদ্যার পরিভাষারও অংশ। এর অর্থ, এমন কোন শব্দক্রম যার সত্যমূল্য (Truth value) আছে (অর্থাৎ মানুষের সামাজিক জ্ঞানে যাকে সত্য বলে মনে করা হয়)। বাংলায়ও সম্ভবত 'প্রস্তাব' কথাটি যুক্তিবিদ্যার পরিভাষায় ব্যবহৃত হতে হয়ে থাকে।

৪) প্রবাল দাশগুপ্ত Phrase কে বলেছেন 'জোট' আর হুমায়ুন আজাদ বলেছেন 'পদ'। 'গুচ্ছ' কথাটিও চোখে পড়েছে। 'পদ' বলতে এখনও বাংলায় বিশেষ্য, ক্রিয়া ইত্যাদি বোঝায়। সুতরাং 'পদ' শব্দটিতে আমার আপত্তি আছে। 'পদাবলী' শব্দটা ভালো কিন্তু চার অক্ষরের হওয়াতে শব্দটি 'বর্গে'র চেয়ে ভারী হয়ে পড়ে। 'জোট', 'গুচ্ছ', 'বর্গ' কথাক'টির অর্থ প্রায় কাছাকাছি। তাহলে 'জোট', 'গুচ্ছ'

কেন ব্যবহার কলাম না? না, একটি অনুমান ছাড়া যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। অনুমানটি হচ্ছে এই যে বুৎপত্তিগত দিক থেকে BARGA আর PHRASE এর মধ্যে সম্ভবতঃ কোন নিকট সম্পর্ক আছে।

তাছাড়া আমি মনে করি যে কোন নবীন বিজ্ঞানের (যেমন সঞ্জননী ভাষা বিজ্ঞান) পরিভাষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে একাধিক প্রতিশব্দ চালু থাকা ভালো বই খারাপ নয়। এতে ব্যবহারকারীরা নিজ নিজ ভাষারুচি অনুসারে প্রতিশব্দ পছন্দ করার সুযোগ পাবে এবং কিছুদিনের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রতিশব্দটি সার্বজনীনভাবে গৃহীত হবে।

৫) মরফেম বা রূপমূলগুলোকে আভিধানিক (Lexical) (যেমন, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ইত্যাদি) আর বৈয়াকরণিক (Grammatical) (যেমন, প্রত্যয়, বিভক্তি, অনুসর্গ ইত্যাদি) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

৬) একসময় গভীর স্তর (Deep structure) এবং ভূমিস্তর (Surface structure) এই দুইই ছিল। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে সঞ্জননী ব্যাকরণে গভীর স্তর পরিত্যক্ত হয়েছে, এর জায়গায় এসেছে অগভীর স্তর। এই গ্রহণ-বর্জনের কারণ আলোচনার পর্যাপ্ত অবসর এ প্রবন্ধে নেই। তবে আপাততঃ একটি জিনিস খেয়াল করা যেতে পারে : তিঙ (বিভক্তি) পাবার জন্য V^0 (ধাতু) কে উঠে আসতে হচ্ছে I^0 স্থানে। উঠে আসার পরের স্তরটি অবশ্যই অগভীর। এর পরে আসবে অভিবাসনের পালা। অভিবাসনের পরে বাক্যটি চলে আসবে ভূমিস্তরে। একই বাক্যে বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক অভিবাসনের ঘটনা ঘটতে পারে। সুতরাং একাধিক অগভীরে স্তরের অস্তিত্ব থাকবে। আমার মনে হয় গভীর স্তর বাদ দেবার প্রধান কারণ হচ্ছে 'গভীর স্তর' বলে সুনির্দিষ্ট কোন স্তর নেই।

৭) কোন বিশেষ বাক্য কাঠামোকে কোন মাতৃভাষাভাষী যখন নির্দ্বিধায় বাতিল করে তখন তার বামে একটি * (তারকা চিহ্ন বা Asterisk আর যখন মাতৃভাষাভাষী কোন বাক্য কাঠামোর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহে থাকে তখন তার বামদিকে? (প্রশ্নবোধক চিহ্ন) বসানো হয়।

৮) পূরক প্রস্তাব মূল প্রস্তাবের অগ্রবর্তী হলে 'বলে' রূপমূলটি 'যে'র পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় :

ঋক কলা খাচ্ছে বলে গার্গী বললো।

এই 'বলে' সম্পূরক 'বল্' ধাতু থেকে সৃষ্টি হয়েছে কিনা বলা কঠিন। তবে রামমূতি (Tikkanen Bertil, 1987) আমাদের জানাচ্ছেন যে মুন্ডা, দ্রাবিড়, তিব্বতি-বর্মী এবং আরও কিছু ইন্দো-ইরানীর ভাষায় (যেমন বাংলায়) 'বলে' বা 'বুলি' রূপমূলটি সম্পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ তথ্যটি মুন্ডা, দ্রাবিড়, তিব্বতি-বর্মী ভাষাগুলো বাংলার সাবস্ট্রাট বা আপস্ট্রার্ট ভাষা ছিল এ দাবীর পক্ষে যুক্তি হিসেবে দেখানো যেতে পারে। কারণ, সম্পূরকের মত বদ্ধ বৈয়াকরণীক রূপমূল দুটি ভাষার মধ্যে সুদীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছাড়া রাতারাতি একটি থেকে অন্যটিতে ঢুকে যেতে পারে না।

তবে চট্টগ্রাম বা নোয়াখালির আঞ্চলিক বাংলায় (হয়তো অন্য আঞ্চলিক বাংলায়ও) 'বলে' 'যে'র মুক্ত বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

২ত) গাগীয়ে কইয়ে যে ঋক ঘুম যার।

২থ) ঋক ঘুম যার যে গার্গীয়ে কইয়ে।

২থ) ঋক ঘুম যার বুলি গার্গীয়ে কইয়ে।

এই 'বলে' রূপমূলটির অন্য ধরনের কিছু ব্যবহারও আছে :

১১) ঋক ভাবলো যে ভূত বলে কিছু নেই।

১২) ঋক বললো যে বৃষ্টি আসলো বলে।

১৩) ঋক ঘুমাচ্ছে বলে গার্গী তাকে ডাকেনি।

৯) ওকামের ক্ষুর নীতি : চতুর্দশ শতকের চিন্তাবিদ William of Occam বলেছেন : non sunt multiplicanda entia praeter necessitatem; i.e. entities are not to be multiplied beyond necessity অর্থাৎ, কোন তত্ত্ব যত বেশি সরল হবে তার গ্রহণযোগ্যতা তত বেশী বাড়বে... ক্ষুর পাতলা হলে তার কার্যক্ষমতা যেমন বাড়ে।

গ্রন্থসূচী:

আজাদ হুমায়ূন (১৯৮৪) বাক্যতত্ত্ব; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Chomsky Noam (1969) Structures Syntaxiques, Editions du Seuil (1969).

Chomsky Noam (1965) Aspects of the Theory of Syntax; The M.I.T. Press (1965).

Chomsky Noam (1993) Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures; Mounton de Gruyter (1993); 371 Pages.

Cowper Elisaheth A (1992 A Concise Introduction to Syntactic Theory : The Government and Binding Approach; The University of Chicago Press.

Dasgupta Probal – Questions and Relatives and Complement Clauses in a Bangla Grammar; New York University Microfilm Sction (1980).

দাশগুপ্ত প্রবাল (১৯৯৬) ভাষা বর্ণনার স্তর; নিসর্গ ভাষাতত্ত্ব সংখ্যা ১৪০০ সাল; আদিয়াবাদ ভাষাতত্ত্ব কেন্দ্র, আদিয়াবাদ, নরসিংদী।

Malmberg Bertil (1968) Les Nouvelles Tendences de la Linguistique; Presses Universitaires de France.

Martinet Andre (1970) Elements de Linguistique Generale, Armand Collin.

Mounin Georges (1972) La Linguistique du XXe siecle, Presses Universitaires de France.

Radford Andrew (1992) Transformational Grammar: A First Course, Cambridge University Press.

Rebuschi Georges লিসঁস (1992-93) ও ম্যাতরিয্ (1993-94) ক্লাসনোট; ILPGA, Universite de Paris III (Sorbonne Nouvelle).
Robins R.H. (1976) Breve Histoire de la Linguistique; Editions du Seuil, Paris.
Tikkanen Bertil (1987) The Sanscrit Gerund: A Synchronic, Diachronic and Typological Analysis; Finnish Oriental Society, Helsinki.